Journal of Social Science and Humanities, Vol.7, No.2, 2025 **Print ISSN: 1811-1564**
https://doi.org/10.59738/jssh.v7i2.84 **e- ISSN: 3136-2109**

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

Journal of Social Science and Humanities (JSSH)

The History of Bangladeshi Cinema and Its Reflected Philosophy

Ashik Biswas[1]* Md. Shahin Alam[2]
[1,2]School of Social Science, Humanities and Languages, Bangladesh Open University

Abstract

This study examined the evolution of Bangladeshi cinema as both an artistic medium and a cultural mirror that reflected the nation's historical struggles, aspirations, and philosophical consciousness. Beginning in the late colonial period and continuing into the early decades after independence, Bangladeshi cinema emerged as a significant platform for addressing questions of national identity, social justice, and collective liberation. This research explored how Bangladeshi films generated philosophical reflections on nationalism, liberation, class struggle, gender, and spirituality. By tracing the interplay between historical context and cinematic expression, the study found that Bangladeshi cinema functioned not merely as entertainment but as a complex philosophical discourse negotiating tensions between tradition and modernity, despair and hope, and realism and abstraction.

Keywords: *Bengali Nationalism, Liberation War, Social Justice, Humanism, Synthetic Philosophy*

বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও প্রতিফলিত দর্শন

সার-সংক্ষেপ: বাংলাদেশের চলচ্চিত্র একটি শৈল্পিক মাধ্যম এবং সাংস্কৃতিক আয়না হিসেবে বিকশিত হয়েছে, যা জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রাম, আকাঙ্ক্ষা এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। ঔপনিবেশিক যুগের শেষের দিকে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের প্রথম দিকের উত্থানকালে, বাংলাদেশি চলচ্চিত্র পরিচয়, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামষ্টিক উন্নয়ন ব্যক্ত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এই গবেষণা প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক গতিপথ পরীক্ষা করে এবং এটি কীভাবে জাতীয়তাবাদ, মুক্তি, শ্রেণী সংগ্রাম, লিঙ্গ এবং আধ্যাত্মিকতার উপর দার্শনিক প্রতিফলনকে মূর্ত করে তা অন্বেষণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং চলচ্চিত্রের প্রকাশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া অনুসরণ করে, দেখা যায় যে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র কেবল বিনোদন নয় বরং একটি গভীর দার্শনিক আলোচনা যা ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা, হতাশা এবং আশা, বাস্তববাদ এবং বিমূর্ততার আলোচনা করে।

মূলশব্দ: বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবতাবাদ, সমন্বয়ী দর্শন।

ভূমিকা

মানুষ অপূর্ণ সত্তা। সে চায় প্রতিনিয়ত পূর্ণ হতে। পূর্ণ হওয়ার বাসনা তার মনেপ্রাণে প্রতিনিয়ত খেলা করে। সেই খেলা তাকে স্বপ্ন দেখায় কখনও ঘুমে, কখনও আবার জাগ্রত অবস্থায়। এরকম অসংখ্য স্বপ্ন থেকে মানুষ নিরেট ধারণা তৈরি করে। আর ধারণাগুলোর প্রকাশ এবং জনমানুষের সামনে প্রকাশ করার জন্য সে কতগুলো মাধ্যমের আশ্রয় নেয়। এই মাধ্যমগুলোকে আমরা জানি উপস্থাপনা শিল্পকলা হিসেবে। আর উপস্থাপনা শিল্পকলার অন্যতম গুরূত্বপূর্ণ

*Corresponding author: Ashik Biswas. E-mail: ashik.biswas@bou.ac.bd
Journal homepage: https://jssh.bou.ac.bd

অনুসঙ্গ হচ্ছে চলচ্চিত্র। একেকটি চলচ্চিত্র একেকটি আদর্শ ও অনাদর্শের আবদ্ধ খেলা। মানুষ অপূর্ণ সত্তা হওয়ায় পূর্ণ আদর্শ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু পূর্ণ হওয়ার অপার বাসনাই তাকে আদর্শ জীবনরূপের অন্বেষণ করতে শেখায়। সেই আদর্শের রূপকল্প স্পষ্ট করার জন্য অনিবার্য হয়ে হয়ে ওঠে অনাদর্শের আপেক্ষিক কাঠামো। এই আদর্শ-অনাদর্শকে ঘিরে এগিয়ে চলে কতগুলো জীবন, যুগ এবং শতকের গল্প। চলচ্চিত্র বাস্তব জীবনের গল্পের রঙ মাখানো রূপ। তাই চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করলে বাস্তব জীবনকে অনুমান করা যায়। অনুধাবন করা যায় জীবনের রূপ। পাশাপাশি এর থেকে বোঝা যায় সামষ্টিক জীবনের আবর্তনের গল্প। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও তাতে প্রতিফলিত মানুষের জীবন ও দর্শন বিশ্লেষণ তাই গুরুত্বপূর্ণ।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমগ্র সমাজ জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এছাড়া চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির নানা বিষয়। আর তাই সাহিত্য, সঙ্গীত, কবিতা, নাটক, নৃত্য, অংকন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও আলাকেচিত্রের পাশাপাশি বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, পরিবেশ, গণসংযোগ, দর্শন, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির সঙ্গেও চলচ্চিত্রের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। চলচ্চিত্র মূলত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল। প্রযুক্তিনির্ভর এই যৌগিক শিল্পমাধ্যমের আবির্ভাব ঘটে উনিশ শতকের শেষদিকে। কিন্তু এর বিকাশ, উন্নয়ন ও বিবর্তন এখনও নানা প্রক্রিয়ায় চলমান। চলচ্চিত্র সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি, জীবন দর্পন স্বরূপ। বর্তমান বাংলাদেশেও এমন কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যেগুলোতে চিত্রিত হয়েছে বাংলাদেশি গণমানুষের জীবন ও দর্শন। ফুটে উঠেছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা বিষয়।

চলচ্চিত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করতে দেখা যায় শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ীসহ নানা স্তরের পেশাজীবী সম্প্রদায়কে। যুগ যুগ ধরে মানুষ তার চারপাশের ঘটমান গতিকে রূপ দেবার স্বপ্ন দেখে এসেছে। কার্ল মার্কস চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো বক্তব্য প্রদান করেননি বটে তবে চলচ্চিত্রকে মার্কসবাদী ধারায় ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যে প্রণোদনা যুগিয়েছেন। চলচ্চিত্রের নান্দনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বাণিজ্যিক ব্যাখ্যায় মার্কসবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়। পুঁজিবাদ বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে জাতীয় পীড়ণ যখন বৃদ্ধি পায় তখনই জাতি অর্জন করতে চায় গণতন্ত্রের পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা। কাজেই মার্কসবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যে দিক হচ্ছে সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর বিশ্লেষণ এবং শ্রেণি-বৈষম্যের স্বরূপ নির্ণয়। আর এমনি ধরণের শ্রেণি-বৈষম্য ও দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র, শোষণ-বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা উত্তরকালে নির্মিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চলচ্চিত্র, বাংলাদেশি মানুষের জীবন ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে যেগুলো হয়ে উঠেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা থেকে স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি তথা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় ঘটনা, বড় অর্জন, সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই যুদ্ধ বাঙালির জাতিসত্ত্বা গঠনে দিয়েছে আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দিয়েছে নতুন উদ্যম এবং দেখিয়েছে ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তির স্বপ্ন, শিখিয়েছে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রত্যয়। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক জীবনে এনেছে পরিবর্তন, শিল্প মানসে এনেছে সৃজনশীলতা। এই সৃজনশীলতার অন্যতম সরব ক্ষেত্র হচ্ছে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র মানুষকে, মানুষের যাপিত জীবনকে, সময়কে ও চারপাশের জগৎকে আবদ্ধ করে রাখে সেললুয়েডের ফিতায়। আর এ বিষয়টি বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য আরো বেশি প্রমাণিত। বাংলা চলচ্চিত্রের আবির্ভাবকাল থেকে অদ্যাবধি নির্মিত চলচ্চিত্রে বাংলাদেশি মানুষের জীবন ও দর্শন নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। অন্যকথায় বাংলা তথা বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের সাথে পরিচালক, প্রযোজকসহ অন্যান্য

কলাকুশলী যারা জড়িত ছিলেন তারা পরম যত্ন ও দক্ষতার সাথে বাংলাদেশি মানুষের জীবন ও দর্শন তুলে ধরেছেন। এসব চলচ্চিত্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রেরণার উৎস। তাই গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত মানুষের জীবন ও দর্শন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভাব উল্লেখ করা। এই গবেষণার মাধ্যমে যেমন মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদ কীভাবে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার চলচ্চিত্রিক উপস্থাপন অন্বেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি লিঙ্গ, শ্রেণি ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিফলন বিশ্লেষণ ও চলচ্চিত্রকে জীবনদর্শন ও সাংস্কৃতিক বয়ান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

এ গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্য উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে **১৯৭১** থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত নির্মিত বাংলা চলচ্চিত্রের প্রিন্ট, ভিসিডি অবলোকন, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ এবং বিভিন্ন প্রকাশনার ব্যবহার, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তথ্য। তবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত বাংলাদেশি মানুষের জীবন ও দর্শন ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন কাজ। গত ৪০ বছরে নির্মিত সমস্ত চলচ্চিত্র রিভিউ করা সম্ভব নয়। গবেষণার সময়, পরিধি ও বিষয়বস্তু বিবেচনা করে **১৯৭১**-২০১০ সাল পর্যন্ত দশকভিত্তিক চলচ্চিত্র ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে তাতে প্রতিফলিত বাংলাদেশি মানুষের জীবন ও দর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণায় বর্ণনা (Description), বিশ্লেষণ (Analysis) ও সংশ্লেষণ (Synthesis) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

চলচ্চিত্রের আবির্ভাব

যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও যন্ত্রপাতির প্রভাব আধুনিক সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নয়ন এবং বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশ্চাত্যের বহু দেশের বহু বিজ্ঞানীর বহু বছরের সাধনায় বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রযুক্তিগত মাধ্যম চলচ্চিত্রের আবিষ্কার পূর্ণতা পায় উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে। ফ্রান্সের লুই লুমিয়ের ও অগাস্ত লুমিয়ের নামে দু'ভাই তাদের আবিষ্কৃত সিনেমাটোগ্রাফ বা চলচ্চিত্র রাজধানী প্যারিসের হোটেল ডি ক্যাফেতে **১**৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শন করেন। তাঁরা এই প্রদর্শনীর নাম দিয়েছিলেন 'সিনেমাটোগ্রাফি লুমেরে'। সর্বমোট ২০ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত ছবিগুলোর মধ্যে ছিল 'বেবিজ সাপার', 'এ বোট ইন দি হার্বার', 'ডেমোলিশন অব এ ওয়াল', অ্যারাইভাল অব এ ট্রেন ইন এ স্টেশন' প্রভৃতি। আধুনিককালে চলচ্চিত্র যেরূপ জনপ্রিয় এবং ব্যাপকভাবে আলোচিত একটি মাধ্যম আবিষ্কারের প্রথম দিকে অবশ্য এমনটি ছিল না।

উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস

চলচ্চিত্রের আবিষ্কার তৎকালীন বিশ্বে সৃষ্টি করেছিল অভূতপূর্ব আলোড়ন। আবিষ্কারের পর পরই বিভিন্ন দেশে নির্মাতাদের উদ্যোগে ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়। পর্দায় চলমান ছবি দেখে মানুষ বিস্মিত ও অভিভূত হলো। বিরাট বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপক উদ্যোগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন (অধুনা বিলুপ্ত), জার্মান, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি প্রদর্শনীও চলতে থাকে দর্শনীর বিনিময়ে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সমসাময়িক কালেই ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। **১**৮৯৬ সালের ৭ জুলাই বোম্বের ওয়াটসন হোটেলে উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত লুমিয়ের ব্রাদার্স (ঝুমা, ২০**১**৪)। ব্যবসাভিত্তিক এই প্রদর্শনীতে সর্বমোট ৬টি ছবি (নির্বাক)

প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিন চারটি শো'র আয়োজনসহ এই প্রদর্শনী ২ মাস যাবৎ চলেছিল। প্রথম শোতে উপস্থিত ছিলেন ২শ' দর্শক। ছবিগুলো হলো: 'এন্ট্রি অফ সিনেমাটোগ্রাফি', 'অ্যারাইভাল অফ এ ট্রেইন', 'দি সি বাথ', 'এ ডেমোলিশন', 'লিভিং দি ফ্যাক্টরি' এবং 'লেডিজ এন্ড সোলজারস্ অন হুইলস'। বিপুল সংখ্যক দর্শক সমাগমের মধ্য দিয়ে এই প্রদর্শনী শেষ হয়েছিল ১৮৯৬ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে। কিন্তু উপমহাদেশে সত্যিকার অর্থে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ১৯০৮ সালে চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু করে এম ডি শেঠনা'র টাওরিং সিনেমা কোম্পানি। অবিভক্ত বাংলায় সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন মি. স্টিফেনস নামক জনৈক বিদেশি ভদ্রলোক। তিনি স্টার রঙ্গমঞ্চে দর্শকবৃন্দকে ছোট ছোট চলচ্চিত্র যেমন- 'ট্রেন চলছে', 'ঘোড়া ছুটছে', 'একটি লোক রাস্তায় পানি দিচ্ছে' প্রভৃতি ছবি দেখান ১৮৯৬-৯৭ সালে। কলকাতার গড়ের মাঠে তিনি প্রথমবারের মতো ছবি প্রদর্শন করেছিলেন। তখনকার চলচ্চিত্রের একটি বিজ্ঞাপন ছিল এই রকম "পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য; বায়োস্কোপ দেখুন, যাহা কেহ কল্পনাও করেন নাই, তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ছবির মানুষ, জীবজন্তু জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় হাটিয়া ছুটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে"। বিজ্ঞাপনটি দিয়েছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় স্টার থিয়েটার। নাট্যাভিনয়ের পাশাপাশি তখন এসব ছবি প্রদর্শিত হতো। স্টিফেনস অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শক হলেও প্রায় একই সময় ইংরেজ পাদ্রী ফাদার লাফোঁ কলকাতায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। তিনি বিদেশ থেকে সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্রপাতি আমদানি করেছিলেন তবে ফাদার লাফোঁর প্রদর্শনী ছিল সীমাবদ্ধ। তিনি সেন্ট জিভিয়ার্স কলেজের ছাত্রদেরকে চলচ্চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দিতেন। এদিক থেকে ফাদার লাফোঁ হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই অঞ্চলে শিক্ষা ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র প্রথম ব্যবহার করেন। কলকাতায় স্টিফেনস-এর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর প্রদর্শক যন্ত্রটির নাম ছিল 'বায়োস্কোপ'। এই 'বায়োস্কোপ' থেকেই এদেশে চলচ্চিত্র পরিচিত হয় 'বায়োস্কোপ' নামে। স্টিফেনস ঐ সময় স্টার থিয়েটারের সঙ্গে মফস্বল শহরও পরিভ্রমণ করেন এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। ষ্টিফেনস এবং ফাদার লাফোঁর পর চলচ্চিত্রে আবির্ভূত হন প্রথম বাঙালি চলচ্চিত্র প্রদর্শক হীরালাল সেন। ঢাকার মানিকগঞ্জের বগজুরি গ্রামে জন্ম গ্রহণকারী হীরালাল সেন ষ্টিফেনস এর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। হীরালাল সেন অক্লান্ত সাধনায় গড়ে তোলেন 'দি রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানী' ৪ এপ্রিল, ১৮৯৮ সালে। তিনি ১৮৯৮ সাল থেকেই চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু করেছিলেন।

শুধু কলকাতায় নয়, তৎকালীন বাংলাদেশের বাইরেও ছবি প্রদর্শন করেন বলে জানা যায়। হীরালাল সেনই হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৩ সালে সর্বভারতে সর্বপ্রথম তিনিই চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল ক্লাসিক থিয়েটারে। সম্ভবত ১৯০১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর আলিবাবা নাটকের মর্জিনা আবদুল্লাহর নৃত্য দৃশ্যের চলচ্চিত্রায়িত অংশ প্রদর্শন করে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ১৯০৪ সালে তাঁর নির্মিত 'আলীবাবা এন্ড ফর্টি থিবস' ছিল একটি অসাধারণ ও স্মরণীয় সৃষ্টি। দর্শকদের নিকট ছবিগুলো বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। এসব দৃশ্যে অমর দত্ত, নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু, কুসুম কুমারী প্রমুখ খ্যাতিমান অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অংশ নিয়েছিলেন। হীরালাল সেন ছোট ছোট প্রায় ২০টি ছবি তুলেছিলেন।

তখনকার ক্লাসিক থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোড়পত্রের মতো পূর্বোক্ত অংশ এবং চলচ্চিত্রায়িত অন্যান্য অংশ দেখানো হতো। অবিভক্ত ভারতের বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তনে 'রয়েল বায়োস্কোপ' এর অবদান অসামান্য। প্রতিষ্ঠার পর এই প্রতিষ্ঠান ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল প্রথম বাংলাদেশের ভোলার এস ডি ও'র বাংলোয় এক সপ্তাহ ধরে ছবি প্রদর্শন করে। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের আমন্ত্রণে তাঁরা জয়দেবপুর প্রাসাদে ছবি প্রদর্শন করেন ১৯০০ সালের ১৫ এপ্রিল। রয়েল বায়োস্কোপ অবিভক্ত বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন চিত্র গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এগুলোর মধ্যে 'জবা কুসুম তৈল' নিয়ে হীরালাল সেন প্রথম বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরি করেন।

মৃত্যুর পূর্বে হীরালাল সেন সর্বমোট ৪০টি ক্ষুদ্র চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দাদাভাই ফালকে (ঢুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে) একটি অবিস্মরণীয় নাম। হীরালাল সেন ১৯১৩ সালে দাদাভাই ফালকে নির্মাণ করেন তাঁর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'। পৌরাণিক কাহিনির উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই ছবিটি ১৯১৩ সালের ৩ মে বোম্বেতে মুক্তি লাভ করে।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন দিগদর্শনের উন্মেষ ঘটালেন অস্কার বিজয়ী বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় (১৯২১-৯২)। ১৯৫৫ সালের ৬ আগস্ট সত্যজিৎ রায়ের বিস্ময়কর শিল্পমন্ডিত ছবি 'পথের পাঁচালী' মুক্তি লাভ করে; যা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে শিল্প আধুনিকতার উন্মোচন ঘটায়। প্রাকসত্যজিৎ পর্বের বাংলা ছবির সর্বপ্রকার শৈল্পিক দারিদ্রের অবসান ঘটে এই ছবির মাধ্যমে। উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে শৈল্পিক অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ এই ছবির প্রভাব ছিল অসামান্য। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' ছবির ৪২ বছর পরে 'পথের পাঁচালী'তে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা যথার্থভাবে প্রয়োগ করে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্মিলন ঘটালেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র চেতনার ও যথার্থ শিল্প নৈপুণ্যের। সত্যজিৎ রায় এরপর একে একে নির্মাণ করলেন 'অপরাজিত' (১৯৫৬), 'জলসা ঘর' (১৯৫৮), 'অপুর সংসার' (১৯৫৯), 'তিন কন্যা' (১৯৬১), 'মহানগর' (১৯৬৩), 'চারুলতা' (১৯৬৪), 'গুপীগাইন বাঘাবাইন' (১৯৬৮), 'অশনি সংকেত' (১৯৭৩), 'সোনার কেল্লা' (১৯৭৪) প্রভৃতি। সত্যজিৎ রায় ব্যতীত অপর যে ক'জন পরিচালক বাংলা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বিশ্বদর্শকের মানসপটে চরম ঔৎসুক্যে উপস্থাপন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার, তপন সিংহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮),'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণ-রেখা' (১৯৬৫), মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ' (১৯৬০), 'প্রতিনিধি' (১৯৬৪), 'আকাশ কুসুম' (১৯৬৫), 'ভুবন সোম' (১৯৬৯) প্রভৃতি ছবি এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য। এসব চলচ্চিত্রকারের মধ্যে সমাজ সচেতনতা ও শিল্পবোধের এতো প্রাধান্য ছিল যে, তা বহু হিন্দী ছবির পরিচালককে অনুপ্রাণিত করে।

বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের ইতিহাস

বাংলাদেশ নামের এ ভূখন্ডে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়েছিল প্রচন্ড জাতীয়তা বোধ থেকে এবং নিজস্ব স্বকীয়তা ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করার প্রত্যয়ে। দেশভাগের পরপরই এপার বাংলায় নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এ দেশের চলচ্চিত্র কর্মীদের কর্মকান্ডে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বাংলা ভাষার আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে যে প্রাণ সঞ্চার করেছিল তার ছোঁয়া সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রে কর্মীদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলত ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরে এ দেশের প্রথম সশব্দ চলচ্চিত্রের নির্মাতা তৎকালীন নাট্য পরিচালক প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার খান পাকিস্তানীদের চ্যালেঞ্জ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। 'মুখ ও মুখোশ' নির্মাণের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এ কথা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, প্রচন্ড দেশ প্রেম ও জাতীয় একটি সংস্কৃতি বিনির্মাণের ভিত্তি ভূমিতে দাঁড়িয়ে আব্দুল জব্বার খান ও তাঁর সহকর্মীরা কারিগরী ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা নিয়েও এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তাঁরা পাকিস্তানীদের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে, ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের পূর্ব বাংলায় প্রকৃতার্থে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব (রহমান, ২০১৬)।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ড. আবদুস সাদেক সচিবালয়ে সংস্কৃতিকর্মী, চলচ্চিত্র পরিবেশক ও প্রদর্শকদের এক সভা আহবান করে ওই সভায় প্রস্তাব রাখেন, বিশ্বের অন্য সকল দেশে যেহেতু চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, সুতরাং আমাদের দেশেও হওয়া উচিত। তাঁর এ প্রস্তাবের বিরোধিতা

করে গুলিস্তান প্রেক্ষাগৃহের কর্ণধার অবাঙ্গালী ফজলে আনিস দোসানী বলেন যে, "অতি বৃষ্টিপাতের জন্য পূর্ব বাংলার আর্দ্র আবহাওয়া চলচ্চিত্র নির্মাণের পক্ষে মোটেও অনুকূল নয়।" দোসানী'র এই বক্তব্যকে স্থানীয় নাট্যকর্মী আবদুল জব্বার খান চ্যালেঞ্জ করেন এবং প্রশ্ন রাখেন, কোলকাতায় চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে পারলে ঢাকায় হবে না কেনো? এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, কেউ ছবি নির্মাণ করুক আর না করুক, এক বছরের মধ্যে তিনি ছবি নির্মাণ করে এ বক্তব্য ভুল প্রমাণ করবেন। সেই মোতাবেক 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তিনি দেখিয়েছেন এ ভূ-খন্ড চলচ্চিত্রের জন্যও উর্বর ভূমি। তাঁরা তাঁদের প্রয়াসে সফল হওয়াতে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পই শুধু যাত্রা শুরু করেনি সে সময়, বরং দেশীয় সংস্কৃতির যে বিরাট ও স্থায়ী প্লাটফর্ম বা ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল তারই বিকাশের কালক্রমিক ধারায় এদেশের চলচ্চিত্র শেষ পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিতেই শুধু রূপান্তরিত হয়নি, বরং এদেশের সাধারণ মানুষের বিনোদন ও সংস্কৃতির আকর শিল্প মাধ্যমে পরিণত হয়েছে (রহমান, ২০১৬)।

১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট অধুনালুপ্ত ঢাকার সদরঘাট এলাকার রূপমহল প্রেক্ষাগৃহে বাংলোদশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' মুক্তি পেয়েছিল। পরিচালক নিজেই নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। নায়িকা চরিত্রে ছিলেন চট্টগ্রামের পূর্ণিমা সেন। পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা সংক্ষেপ এফডিসি ছাড়াও পপুলার স্টুডিও, বারী স্টুডিও এবং বেঙ্গল স্টুডিও বাংলোদশের চলচ্চিত্র পরিস্ফুটনে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এফডিসি প্রতিষ্ঠা

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে বিল পাসের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদে বিল উত্থাপন করেন ক্ষমতাসীন সরকারের যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। এফডিসি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন বিশিষ্ট বেতার ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব নাজীর আহমদ। সরকার তাঁকে এফডিসির নির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এফডিসি কিছু নির্বাচিত নির্মাতাকে ছবি করার অনুমতি দেয়। এফডিসিতে প্রথম ছবি 'আসিয়া' কাজ শুরচ্ করেন ফতেহ লাহোনী। ছবির নেপথ্য স্থপতি হিসেবে কাজ করেন নাজীর আহমদ। 'আসিয়া' (১৯৬০) ছিল গ্রাম বাংলার পটভূমিকায় নির্মিত শিল্প শোভন ছবি। এটি ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ বাংলা চলচ্চিত্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদক পায়।

এফডিসির পরবর্তী ছবি 'জাগো হুয়া সাভেরা' (১৯৫৯) উর্দু ভাষায় পরিচালনা করেন আখতার জং কারদার। ছবির কাহিনি নেয়া হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে নির্মিত প্রাথমিক পর্বের এই ছবিটি মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারসহ লন্ডন-নিউইয়র্ক-সানফ্রানসিসকোতে প্রদর্শিত হয়ে ১১টি আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করে।

চলচ্চিত্রে ইতিহাস ও গণ-আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে এসে যায় ইতিহাস ও গণ-আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্রের কথাও। চলচ্চিত্রের নির্মাণ ধারায় বিষয়বস্তু হল যুদ্ধ, আন্দোলন, লড়াই। বাঙালির যুদ্ধাভিজ্ঞতার তালিকায় রয়েছে ১৭৫৭ সালের পলাশীর ঘটনা, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, মাস্টার দা সূর্যসেনের সশস্ত্র অভিযান, স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি। এছাড়াও রয়েছে ফকির বিদ্রোহ, তিতুমিরের কৃষক বিদ্রোহ, শরীয়তুল্লাহর ফরাজী আন্দোলন এবং বারো ভূইয়াদের সংগ্রামের ঘটনা। এসব যুদ্ধ-সংগ্রাম-আন্দোলন বিদ্রোহের কথা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সকল আন্দোলন বাঙালিদের যুদ্ধাভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়িয়ে দেয়। বিশ শতকে সমগ্র বিশ্বের মতো বাংলাদেশের মানুষেরও অভিজ্ঞতার তালিকায় যুক্ত হয় দুটো বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) (১৯৩৯-১৯৪০) ব্যাপকতা ও ধ্বংসযজ্ঞ। ভূমি থেকে মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত যুদ্ধের প্রভাব পড়ে শিল্প-সাহিত্য-

সংস্কৃতিতেও। প্রথম মহাযুদ্ধে বাঙালিদের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার ৪৯ নং বাঙালি পল্টন নামে আলাদা রেজিমেন্টও গঠন করে নিজেদের স্বার্থে। সে অভিজ্ঞতার ছাপও পড়ে বাঙালিদের মননে। কলকাতায় নির্মিত কয়েকটি চলচ্চিত্র যেমন 'পথের দাবী' (১৯৪৬), 'জয়তু নেতাজী' (১৯৪৭), 'দেবী চৌধুরানী' (১৯৪৯), 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' (১৯৪৯), 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯৫২)।

বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ধারা

চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ধারা যখন কোন চলচ্চিত্র বিষয়বস্তু, নির্মাণশৈলী, আঙ্গিক, আদর্শ ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে অন্য একটি চলচ্চিত্রের অনুরূপ হয়ে যায় তখন সেটি একটি শ্রেণি বা ধারায় রূপ নেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের শ্রেণি বা ধারার অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন ফ্রান্সের আভাগাদ (Avant-garde or narrative avant-garde), ইটালির নব্যবাস্তবতাবাদ (Neorealism), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টার্ণ (American Western) ইত্যাদি। ফ্রান্সের আভাগাদ ছিল ১৯২০-এর দশকের একটি চলচ্চিত্র আন্দোলন, যেখানে মানুষের অনুভূতি, মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতালির নব্যবাস্তববাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইতালিতে গড়ে ওঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রধারা। এ ধারায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য ও সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরা হয়। মার্কিন ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্র মূলত আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের জীবন, কাউবয় সংস্কৃতি, সীমান্ত সংঘর্ষ ও আইন-শৃঙ্খলার লড়াই নিয়ে নির্মিত। চলচ্চিত্রের এ ধারায় আমেরিকার সীমান্তজীবন ও বীরত্ব তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শ্রেণি বা ধারার উদ্ভব হয়েছে। কখনো এ ধারা এসেছে বাণিজ্যিক কারণে, কখনো নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে, কখনো দায়বদ্ধতা, শিক্ষা, রুচি ও মেধার প্রেক্ষাপটে। ১৯৫৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে কয়েকটি ধারা লক্ষনীয়। যেমন, ১। সামাজিক চলচ্চিত্র। ২। উর্দুভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র (১৯৫৯-১৯৭০)। ৩। লোকগাঁথা ও রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্র। ৪। ইতিহাস ও গণআন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র। ৫। মারদাঙ্গা চলচ্চিত্র। ৬। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। ৭। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ৮। প্রামাণ্যচিত্র। ৯। অন্যান্য চলচ্চিত্র (অশ্লীল, প্রতিহিংসাপরায়ন, কুরুচিপূর্ণ) (হায়াৎ, ২০১১)। বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সামাজিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাহিত্য, রূপকথা, লাকোগাঁথা, অভিযান, রহস্য, যুদ্ধ, মারপিট, বিজ্ঞান, যৌনতা, ভ্রমণ, প্রচার, বিজ্ঞাপন, তথ্য, মনস্তত্ত্ব, জীবজন্তু, এ্যানিমেশন, শিশু-কিশারে, ক্রীড়া, শিক্ষা, নিরীক্ষামূলক ইত্যাদি (হায়াৎ, ২০১১)।

এছাড়া দর্শকদের রুচির উপরও নির্ভর করে চলচ্চিত্রের আধেয়। তবে যতজনে যত কথাই বলুক, চলচ্চিত্রের আধেয়ের গতি-প্রকৃতি সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করলেও শেষ পর্যন্ত নজর দিতে হয় তার বাজারের উপর। চলচ্চিত্র একই সাথে শিল্প, পণ্য এবং গণমাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে, এ তিনটি অভিধা চলচ্চিত্রের তিনটি পর্যায়কে নির্দেশ করে। চলচ্চিত্রের উপাদানগত কম্পোজিশনে তা শিল্পরূপ, যখন পরিবেশনার জন্য হস্তান্তরিত হয় তখন তা পণ্যরূপ এবং দর্শকদের কাছে পৌঁছা মাত্র তা যাগোযাগে মাধ্যম অর্থাৎ গণমাধ্যম রূপ লাভ করে (আফসানা, ২০১০)। তবে চলচ্চিত্রে নির্মাতার ইচ্ছেই শেষ কথা। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চাইবেন তাই-ই চিত্রায়িত হবে। অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমের বিকাশ চলচ্চিত্রের প্রবল প্রতাপকে পৃথিবীব্যাপী কমিয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত ঠিকই টিকে আছে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র গবেষক সাজেদুল আউয়াল প্রথম দিকের চলচ্চিত্র রচনার ক্ষেত্রে দু'টি প্রবণতা লক্ষ করেছেন; একদল চেয়েছে সমাজ-বাস্তবতাকে তুলে ধরতে, অন্যদল কল্পিত কোনো বিষয়কে চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করতে (আউয়াল, ২০১১)।

বাংলদেশ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মাহমুদুল হোসেন চলচ্চিত্রের আপাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন - ভৌত অবকাঠামো (চলচ্চিত্রটি যেই স্থান এবং কাল বিবেচনায় চিত্রায়িত), সংগীত, রাজনীতি এবং বাণিজ্য (হোসেন, ২০১০)। চলচ্চিত্র একাধারে আর্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি। একই সঙ্গে মানবিক ও বাণিজ্যিক। অর্থাৎ চলচ্চিত্র হচ্ছে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত শিল্প চর্চার একটি মাধ্যম। চলচ্চিত্রকে বহুমুখী পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা হয়, যা একই সঙ্গে তথ্য মাধ্যম, শিল্প মাধ্যম, বিনাদেন মাধ্যম ও বাণিজ্যিক মাধ্যম। পৃথিবীর সর্বত্র বিনোদন বঞ্চিত মানুষের জন্য চলচ্চিত্রই বিনোদনের মুখ্য মাধ্যম। বাংলোদশেও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়।

গবেষক মির্জা তারেকুল কাদের বিষয়-বিবেচনা থেকে বাংলোদশের চলচ্চিত্রকে ৮টি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন - সামাজিক, লোকছবি, যুদ্ধ, আলোচনা হয়েছে, তাতে কালানুক্রোম ফ্যান্টাসি, থ্রিলার, কমেডি, ঐতিহাসিক এবং শিশুতোষ (কাদের, ১৯৯৩)।

বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত দর্শন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভার

চলচ্চিত্র একটি অঞ্চলের মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা- চেতনাকে প্রভাবিত করে ব্যাপকভাবে। আবার ঐ অঞ্চলের আবহমান কালের সংস্কৃতি থেকে ধার করা চিন্তাচেতনায়ও সমৃদ্ধ হয় চলচ্চিত্র জগৎ। চলচ্চিত্র আজ সাধারণ মানুষের কাছে বিনোদন, তথ্য ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সপ্তকলার সমন্বয়ে গঠিত চলচ্চিত্রে জীবন, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির চিত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এতে তুলে ধরা হয় মানুষের আশা-হতাশা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের পাশাপাশি সত্য-সুন্দর-কল্যাণের কথাও। বাংলা চলচ্চিত্র সূচনালগ্ন থেকেই বাংলাদেশি মানুষের জীবনকে উপজীব্য করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে। এসব চলচ্চিত্রে আবহমানকালের বাঙালি জীবন যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি এসব চলচ্চিত্র বাঙালি জীবনকেও প্রভাবিত করেছে নানা আঙ্গিকে।

অন্যদিকে দর্শন হলো সমাজ ও জগৎকে দেখা ও ব্যাখা করার দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাচীন গ্রিসে জগৎকে ব্যাখ্যার জন্য যে প্রাকৃতিক দর্শনের সূত্রপাত হয়েছিলো তা কাল পরিক্রমায় ভাববাদ, বস্তুবাদ, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা অসংখ্য ভাবধারার উন্মেষ ঘটিয়ে আধুনিকতর স্তরে পৌঁছেছে। যেকোনো দর্শন তার কালের সৃষ্টি। দর্শন সমাজ ও জগৎকে ব্যাখ্যা করে সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে। দর্শনের কাজ মানুষের সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করা, মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষা মেটানো। মানব সমাজের উপর দর্শনের প্রভাব অপরিসীম। মানব জীবনকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের উপরও রয়েছে দর্শনের ব্যাপক প্রভাব। আবার কোনো কোনো সাহিত্য ও চলচ্চিত্র থেকে উদ্ভূত হয় উচ্চমানের জীবনদর্শন। চলচ্চিত্র ও দর্শনের সম্পর্ক তাই সম্পূরক। বাঙালি চলচ্চিত্রকারকেরা যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন তাতেও পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনের নানা ভাবধারার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আবার সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, জহির রায়হানের মত বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারেরা তাদের নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যদিয়ে নবধারার দর্শন সৃষ্টি করেন।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে বরাবর প্রেমই প্রধান উপজীব্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আর কিছু অনুষঙ্গ কৌতুক, নাচ, গান, মারামারি ইত্যাদি। সব অনুষঙ্গ যুক্ত হয় প্রেমকে ঘিরে। অর্থাৎ একটি প্রেমের গল্পকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্ত হয় এসব অনুষঙ্গ। প্রথম পর্যায়ে সবকিছু মোটামুটি ঠিক থাকলেও ক্রমাগত অশ্লীল নাচ এবং মারামারি, যাকে বলে ফাইটিং যুক্ত হয়েছে। শেষ দু'টি অনুষঙ্গ চলচ্চিত্রকে দিন দিন অধঃপতিত করেছে। যতো উদ্ভট সাজসজ্জা, অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কতো ক্রিয়াকলাপই না ঘটে থাকে এই দু'টি অনুষঙ্গকে ঘিরে! চলচ্চিত্র বিকশিত হওয়ার কথা ছিল কারিগরি চমৎকারিত্বে এবং ভাবনা ও নির্মাণের অভিনবত্বে; তা না হয়ে চলচ্চিত্রে জুড়ে বসেছে অশ্লীলতা, নৃশংস মারামারি, দুর্বল গল্প, দুর্বল কারিগরি মান ইত্যাদি। এটিকে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের নেতিবাচক দিক হিসেবে

গণ্য করা যায়। আর এ নেতিবাচকতার কারণে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত বাংলাদেশি মানুষের জীবন ও দর্শন ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন কাজ। গত ৪০ বছরে নির্মিত সমস্ত চলচ্চিত্র রিভিউ করা সম্ভব নয়। গবেষণার পরিধি ও বিষয়বস্তু বিবেচনা করে ১৯৭১-২০১০ সাল পর্যন্ত নির্মিত চলচ্চিত্র ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে তাতে প্রতিফলিত বাংলাদেশি মানুষের জীবন ও দর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ১৯৫৬ সালে বাংলাদেশে 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত উল্লেখখযোগ্য সংখ্যক চলচ্চিত্র তৎকালীন পূর্ববাংলায় নির্মিত হয়েছিলো। বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য পরিচালক বেশকিছু বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে দেশে শুরু হয় প্রবল ছাত্র ও গণআন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। গণআন্দোলনকে নিয়ে জহির রায়হান ১৯৭০ সালেমুক্তি দেন এদেশের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া'।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী চলচ্চিত্রগুলো সম্পর্কে আলমগীর কবির তার ফিল্ম ইন বাংলাদেশ গ্রন্থে একটি পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন, এ সময় চার ধরনের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তিনি এই চার ধরনের চলচ্চিত্রকে শ্রেণিকরণ করেছেন- যুদ্ধ চলচ্চিত্র, মৌলিক চলচ্চিত্র, নকল চলচ্চিত্র ও অফ বিট চলচ্চিত্র। তার দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৭২ থেকে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৭ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের মাঝে ৫টি চলচ্চিত্রর ২৫টি মৌলিক চলচ্চিত্র, ১২৫টি নকল চলচ্চিত্র এবং ৮টি অফ বিটের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ মোট মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রর সংখ্যা ১৬৩টি। তিনি তার পরিসংখ্যানে বলেছেন, তখনকার দর্শকরা অফবিট এক্সপেরিমেন্টাল চলচ্চিত্রের পাশাপাশি নকল চলচ্চিত্রকেও গ্রহণ করেনি। এদেশের পরিচালকদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও নান্দনিকতার অভাবেই মূলত নির্মাতারা সকল ছবি তৈরি করেন (Kabir, 1979)।

সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর সমান্তরালে, আবার কখনো কখনো মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যিক চাপ ও বাজারনির্ভরতার কারণে সমঝোতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে নানা চড়াই-উতরাই অতিক্রম করতে হয়েছে। এ কারণে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন দেশজ বাস্তবতা, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক আচরণকে উপস্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি বাজারের চাহিদা, বিনিয়োগের প্রত্যাশা এবং দর্শকপ্রবণতার প্রভাবও গভীরভাবে কাজ করে (আহমেদ, ২০০৮)। ফলে অনেক সময় চলচ্চিত্র বাস্তব জীবনের স্বরূপনিষ্ঠ উপস্থাপনা বজায় রাখলেও, কিছু ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সফলতার তাগিদে অতিরঞ্জন, অবাস্তবতা বা কৃত্রিম নাটকীয়তার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

এ প্রবণতা বিশেষত যখন নির্মাণে শিল্পগত স্বাধীনতা সীমিত হয় বা বাজারকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পায়, তখন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন দর্শক-চাহিদা দ্রুত বিনোদনকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, তখন গল্পের অন্তর্নিহিত গভীরতা ও বাস্তবতার সূক্ষ্ম উপস্থাপন অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ পরিস্থিতিতে নির্মাতারা অনেক ক্ষেত্রে শিল্পগত ন্যায্যতার চেয়ে বাণিজ্যিক গ্রহণযোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হন। তাছাড়া প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কারিগরি জনবলের অভাব এবং শিল্পভিত্তিক গবেষণার দুর্বলতা কিংবা গবেষণাভিত্তিক চলচ্চিত্রচর্চার দুর্বলতাও চলচ্চিত্রের সামগ্রিক গুণগত মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসব কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে একই সামাজিক বাস্তবতাকে ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রেও বাস্তবধর্মী উপস্থাপনা ও অতিনাটকীয় কল্পনার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

তবে এটি লক্ষণীয় যে সর্বোপরি বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে গল্পের পটভূমির বিশাল অংশ জুড়ে থাকছে বাংলাদশেরই ক্যানভাস। এছাড়া চলচ্চিত্র মাধ্যমও মানুষকে স্বরূপে চিত্রায়িত করতে চায় বা তার পারিপার্শ্বিকের রূপায়ণ চায়।

আবার অনেক সময় এটার অনুপস্থিতিও ঘটে। প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্র কেবল বাস্তবতার প্রতিফলন নয়; এটি নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োজনাগত সীমাবদ্ধতা এবং দর্শকের প্রত্যাশার সমন্বিত ফল। তাই একই মাধ্যমে কখনো বাস্তবসম্মত জীবনচিত্র, আবার কখনো কল্পনানির্ভর বা অতিরঞ্জিত উপস্থাপনাও দেখা যায়।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে দেশজ পটভূমির পাশাপাশি বাস্তবতা ও কল্পনার দ্বৈততা একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা পরবর্তী আলোচনায় আরও গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

আবহমান বাংলা ও লোক সংস্কৃতি

বাংলাদশি চলচ্চিত্রে সূত্রপাত হয়েছিলো নিজস্ব স্বকীয়তা ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করার প্রত্যয়ে। বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনাপর্বে অভিযোগ করা হয়েছিলো যে,অতি বৃষ্টিপাতের জন্য পূর্ব বাংলার আর্দ্র আবহাওয়া চলচ্চিত্র নির্মাণের পক্ষে মোটেও অনুকূল নয়। এ অভিযোগের প্রতিবাদে নাট্যকর্মী আবদুল জব্বার খান প্রশ্ন রাখেন, কলকাতায় চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে পারলে ঢাকায় হবে না কেনো? এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, কেউ ছবি নির্মাণ করুক আর না করুক, এক বছরের মধ্যে তিনি ছবি নির্মাণ করে এ বক্তব্য ভুল প্রমাণ করবেন। সেই মোতাবেক 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তিনি দেখিয়েছেন এ ভূ-খন্ড চলচ্চিত্রের জন্যও উর্বর ভূমি। আমরা দেখতে পাই এ ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে নির্মিত অসংখ্য চলচ্চিত্রের পটভূমি আবহমান বাংলা তথা বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। বাংলাদশের সমাজ এবং লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে এসব চলচ্চিত্র। 'লাঠিয়াল' (১৯৭৫), 'সুজন সখী' (১৯৭৫), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩), 'সূর্যদীঘল বাড়ি' (১৯৭৯), 'বেদের মেয়ে জোসনা' (১৯৮৯), 'দোলনা' (১৯৯১), নারায়ন ঘোষ মিতার 'সাজানো বাগান' (১৯৯০), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৯৩), 'শ্রাবণ মেঘের দিন' (২০০০), 'লাল সালু' (২০০১), তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না''(২০০১), আবু সায়ীদের 'কীর্ত্তনখোলো' (২০০১) এ ধারার উলে-খযোগ্য চলচ্চিত্র।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামে জয় পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানিদের ধর্মভিত্তিক, অর্থনীতিভিত্তিক, প্রশাসনিক, সামরিক যে আধিপত্য এই সবকিছুর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণাটি গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যেসব চলচ্চিত্র নির্মিত হয় স্বাভাবিকভাবেই তাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গটা তখনই তুলেছিলেন, ৪৮ সালেই। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেটা একটা চেহারা পায়। সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলনের ব্যাপারটাই বায়ান্ন সালে প্রকট হয়ে গিয়েছিল এবং ১৯৬২ সালে শিক্ষা অধিকার আদায়ের আন্দোলন হয়েছে। প্রথমটা সাংস্কৃতিক অধিকার, দ্বিতীয়টি শিক্ষার অধিকার। তারপরই আমরা দেখি ছয় দফার আন্দোলন, সেটা অর্থনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলনেরই একটা সংগ্রাম ছিল। সেই সূত্র ধরে ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলন হয়, ১৯৭০ সালে নির্বাচন হয় এবং আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তারপরও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারে না। ফলে যেটা হলো, ১৯৭১ সালে এখানে একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হলো। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, এই নানামুখী স্বাধিকার আন্দোলনগুলো মিলেমিশে একপর্যায়ে এসে ১৯৭১ সালে একটা রাজনৈতিক চেহারা অর্জন করে এবং একটা রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে অঞ্চলটা এগিয়ে যায়। সেই সময়কার মুক্তিযোদ্ধা, সংস্কৃতিকর্মী বা জনগণের কী ভূমিকা ছিল তা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় (আউয়াল, ২০১৭)। তবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু চলচ্চিত্র নিখাঁদ বাণিজ্যিক উদ্দেশে তৈরি করা হয়েছিলো।

খান আতাউর রহমানের 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৭) সম্ভবত প্রথম ছবি, যেখানে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চেতনার লক্ষণ প্রথম চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। এর তিন বছর পর ১৯৭০ সালে জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটি গণ-আন্দোলনের উত্তপ্ত মুহূর্ত সরাসরি ধারণ করে। ডকুমেন্ট্রি বা দলিলি ছবি আকারে নয়, ছবির গল্পের মধ্যেই। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের জাতীয় চেতনা ততদিনে একটা উত্তাল রূপ নিয়ে নিয়েছে। ছবির মধ্যে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি সংযোজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চেতনার চরিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্র সরাসরি অংশগ্রহণ করে। সব মিলিয়ে ছবিটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামের অংশ হয়ে যায়। এই ঘটনাগুলো ঘটেছে একাত্তরের আগে। পূর্ব পাকিস্তানে ছবি তৈরির সংকল্প, সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মধ্যে জাতীয় চৈতন্য নির্মাণের কাজগুলো বিচিত্র ও অদৃশ্য পথে নানানভাবে সম্পাদিত হয়েছে (আউয়াল, ২০১৭)। 'ওরা ১১ জন' (১৯৭২), 'সংগ্রাম' (১৯৭৪), 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৯৭), 'মুক্তির গান' (১৯৯৫), 'নদীর নাম মধুমতি' (১৯৯৬), 'শ্যামল ছায়া' (২০০৫) এ ধারার স্বাধীনতা উত্তরকালের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র।

মূলত চলচ্চিত্র হলো মানুষের জীবন, স্বপ্ন ও বাস্তবতার মধ্যকার দ্বন্দ্বকে দৃশ্যভাষায় রূপ দেওয়ার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম। গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের সূচনা থেকেই এটি কেবল বিনোদন নয়, বরং সামাজিক অভিজ্ঞতা ও জাতীয় চেতনার প্রতিফলন হিসেবে বিকশিত হয়েছে। মানুষের জীবনের বাস্তবতা, স্বপ্ন এবং আদর্শের মধ্যকার সম্পর্ককে প্রতীকী ও নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করে চলচ্চিত্র। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের বিকাশ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এটি বিশেষভাবে জাতীয় পরিচয় নির্মাণ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। ফলে চলচ্চিত্র একদিকে যেমন ইতিহাসের দলিল, অন্যদিকে সামাজিক চেতনার বাহক হিসেবে কাজ করেছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো বাংলাদেশি চলচ্চিত্র সমাজের ক্ষমতা কাঠামোকে প্রতিফলিত ও পুনর্গঠন করে। মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন এবং গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো জাতীয়তাবাদী চেতনার সাংস্কৃতিক রূপায়ণ হিসেবে কাজ করেছে। চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত রাজনৈতিক বাস্তবতা কেবল ইতিহাস নয়; বরং এটি রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও নাগরিক চেতনার মধ্যকার দ্বন্দ্বকেও প্রকাশ করে। ফলে চলচ্চিত্র একটি রাজনৈতিক বয়ান (political discourse) হিসেবে অনেকাংশে সফলভাবে কাজ করেছে। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিফলন ঘটেছে সফলভাবে।

পুরুষতান্ত্রিকতা

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা মূলত পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত বাংলাদেশি চলচ্চিত্রেও এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এটি সমাজের বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোরই প্রতিফলন, যা চলচ্চিত্রে পুনরুৎপাদিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রেমনির্ভর মেলোড্রামা ধারার চলচ্চিত্রে নায়ক চরিত্রের প্রাধান্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যেখানে নায়িকা বা নারী চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই গৌণ অবস্থানে থাকে। উদাহরণ হিসেবে 'সুজন সখী' (১৯৯৪), 'দোস্ত দুশমন' (১৯৭৭), কিংবা পরবর্তী সময়ের বাণিজ্যিক ধারার অনেক চলচ্চিত্রে নায়ককে পেশাজীবী, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এবং পরিবারের একমাত্র কর্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে নারী চরিত্রকে সাধারণত আবেগনির্ভর, নির্ভরশীল এবং সহায়ক ভূমিকায় দেখানো হয়। এই কাঠামোর মধ্যে পুরুষ চরিত্রকে প্রায়শই নারীর আশ্রয়দাতা ও উদ্ধারকর্তা হিসেবে নির্মাণ করা হয়, ফলে পুরুষকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মানবসত্তা হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের উপস্থাপন চলচ্চিত্রে লৈঙ্গিক ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতাকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

নারী চরিত্র ও নারী অধিকার

বাংলা চলচ্চিত্রে বহু ক্ষেত্রে সস্তা বিনোদনের উদ্দেশ্যে নারীকে হেয় বা বস্তুকেন্দ্রিকভাবে উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচালনা থেকে শুরু করে প্রযোজনা ও নির্মাণের বিভিন্ন স্তরে যেহেতু অধিকাংশই পুরুষ, তাই চলচ্চিত্রে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও নারী চরিত্র নির্মাণে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের উপস্থাপন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বহু ক্ষেত্রে এটি সামাজিক পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোরই প্রতিফলন। এই প্রেক্ষাপটে জেন্ডার রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে নারীকে অনেক সময় নিপীড়িত, নির্ভরশীল, গৌণ বা ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নারীবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্ব (feminist film theory)- এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি একটি সাংস্কৃতিক বক্তব্য কাঠামো (cultural discourse), যেখানে লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার সম্পর্ক পুনরুৎপাদিত হয়। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে এই পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী প্রায়শই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি-নির্ভর উপস্থাপন (male gaze) দ্বারা নির্মিত একটি বস্তুগত চরিত্র (object) হিসেবে উপস্থিত হয়, যেখানে তার অস্তিত্ব কাহিনি কাঠামো (narrative)-র কেন্দ্রে না থেকে পুরুষ চরিত্রের গল্পকে এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে বাণিজ্যিক ধারার জনপ্রিয় মেলোড্রামা ও অ্যাকশননির্ভর চলচ্চিত্র যেমন 'বেদের মেয়ে জোসনা' (১৯৮৯), 'আনন্দ অশ্রু' (১৯৯৭), কিংবা 'সুজন সখী' (১৯৯৪)-এর মতো চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রকে অনেক ক্ষেত্রে কাহিনির কেন্দ্র না করে প্রেম, ত্যাগ, নায়কের আবেগ, প্রতিশোধ বা সম্পর্কগত দ্বন্দ্বের অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে পুরুষ চরিত্রকে শক্তিশালী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদকারী, সংঘাত নিরসন ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এবং নারীর রক্ষাকর্তা ও নারীর প্রতি অনুগ্রহকারী হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে সামাজিক কর্তৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ চরিত্রের হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে, নারী চরিত্র অনেক সময় কাহিনিগত সক্রিয়তা (narrative agency) হারিয়ে নিষ্ক্রিয় চরিত্র (passive subject)-এ পরিণত হয়।

পর্দায় জেন্ডার ধারণার এরূপ উপস্থাপন ঘটানো হয় নারী ও পুরুষের উপস্থাপনের ভিন্নতা দ্বারা। এই বৈষম্যমূলক উপস্থাপনের ফলে পর্দায় নারীকে প্রায়শই সৌন্দর্যের প্রতীক এবং পুরুষকে ইস্পাতকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়। সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে 'আইটেম গান' ও দৃশ্যগত অতিআকর্ষণীয় উপস্থাপন (visual glamorization)-এর মাধ্যমে নারীকে দর্শক আকর্ষণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতাও এই লিঙ্গভিত্তিক বস্তুকরণ (gender objectification)-কে আরও দৃঢ় করেছে। এতে নারী দেহ সামাজিক অর্থ নির্মাণের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা নারীর স্বতন্ত্র মানবিক পরিচয়কে আড়াল করে দেয়। এমনকি একটিও প্রতিবাদী, আত্মনির্ভরশীল নারী চরিত্র দেখা যায় নি চলচ্চিত্রে (আবির, ২০১৬)।

তবে একে সম্পূর্ণ একমাত্রিক প্রবণতা হিসেবে দেখা যায় না। কিছু ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্রে নারীর সামাজিক অবস্থান, সংগ্রাম ও আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'সূর্যদীঘল বাড়ি' (১৯৭৯), 'মাটির ময়না' (২০০২) এবং 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৯৭)-এ নারী চরিত্র তুলনামূলকভাবে বাস্তবধর্মী ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সক্রিয় ও সংবেদশীল ভূমিকা পালন করেছে, যা প্রচলিত ধারণাগত ছকবদ্ধতা (stereotype)-কে আংশিকভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন আরও জটিল। গবেষণায় দেখা যায়, এসব চলচ্চিত্রে নারী চরিত্র প্রায়শই সহিংসতা, বিশেষ করে যৌন সহিংসতা, নির্যাতনের অভিজ্ঞতা ও ট্রমার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারী চরিত্র বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারীর মূূল অবয়ব সে ধর্ষিত (গায়েন, ২০১২)। এর ফলে নারীকে অনেক সময় ইতিহাসের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে নয়, বরং ভুক্তভোগী হিসেবে সীমাবদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা তার রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্ষমতা (agency)-কে সংকুচিত করে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের উপস্থাপন একদিকে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন হলেও অন্যদিকে এটি পুরুষতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কাঠামোর পুনর্গঠন প্রক্রিয়ারও অংশ। ফলে নারী অধিকার ও জেন্ডার সমতা চলচ্চিত্রে এখনো একটি অসম্পূর্ণ ও বিকাশমান আলোচ্য ক্ষেত্র হিসেবে রয়ে গেছে।

সমন্বয়ী দর্শন

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে চিত্রিত জীবনধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে ভাববাদ-বস্তুবাদ, ইহলৌকিক-পারলৌকিক, অদৃষ্টবাদ-নিয়ন্ত্রণবাদ প্রভৃতি ধারার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছে। তাই বাংলাদেশি চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং এটি সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির প্রতিফলন। এ ধারার চলচ্চিত্রে বহুমাত্রিক দর্শনের সমন্বয় দেখা যায় ধর্মীয় চেতনা ও মানবতাবাদ, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, বাস্তববাদ ও কাব্যিকতা, ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। এই কারণে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে "সমন্বয়ী দর্শন"-এর বাহক বলা যায় (Kabir, 1979)। সমন্বয়ী দর্শন বলতে বোঝানো হয় পাশ্চাত্য আধুনিকতা ও দেশীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিক বোধ, শিল্পরীতি ও বাস্তববাদী দৃষ্টির মধ্যে একটি ভারসাম্য রচনা।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের সূচনা পাকিস্তান আমলে হলেও ধীরে ধীরে দেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যায়। স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ ও গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার দলিল (হায়াৎ ১৯৮৭)। জহির রায়হানের জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্র যেমন রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতীক, তেমনি তা দর্শনগতভাবে কর্তৃত্ববাদ বিরোধী এক নৈতিক অবস্থান প্রকাশ করেছে (রহমান, ২০১৬)।

সমন্বয়ী দর্শনের রূপায়ণ দেখা যায় ধর্ম ও মানবতাবাদ, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা এবং রাজনীতি ও নৈতিক দর্শনে।

বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ধর্মীয় চেতনা ধারণ করলেও তা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং মানবিক মুক্তির হাতিয়ার। যেমন তানভীর মোকাম্মেলের 'লালন' চলচ্চিত্রে ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গ মানবতাবাদের সঙ্গে একীভূত হয়েছে (মোকাম্মেল, ২০১৩)। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে বাউল-ভাটিয়ালি, পালাগান, গ্রামীণ সংস্কৃতি যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি আধুনিক শহুরে জীবন ও বৈশ্বিক প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে। তৌকির আহমেদের 'দারুচিনি দ্বীপ' আধুনিক সম্পর্কের গল্প হলেও দেশীয় আবেগ ও সামাজিক মূল্যবোধকে ধারণ করে (আহমেদ, ২০১৮)। জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া' কেবল স্বৈরাচারবিরোধী রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নয়, বরং নৈতিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করে অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো নাগরিক দায়িত্ব (Hossain Raju, 2015)। অর্থাৎ বাংলাদেশি চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের ক্ষেত্র নয়; এটি সমন্বয়ী দর্শনের ভান্ডার। এখানে ঐতিহ্য, আধুনিকতা, মানবতাবাদ, নৈতিকতা ও নান্দনিকতার সংমিশ্রণ ঘটে। ফলে চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক, রূপান্তরকারী এবং একাধারে দার্শনিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্র।

উপসংহার

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের বিকাশধারা বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে প্রতিফলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক চেতনাকে অন্বেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী জাতি গঠনের প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র কীভাবে জাতীয়তাবাদ, সামাজিক বাস্তবতা, শ্রেণি-সংঘাত, লিঙ্গবৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে তা আলোচনায় উঠে এসেছে। গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক বয়ান (cultural discourse), যেখানে সমাজের ক্ষমতা কাঠামো, রাজনৈতিক চেতনা এবং জীবনদর্শন একত্রে প্রতিফলিত হয়। এই গবেষণায় বর্ণনামূলক (descriptive), বিশ্লেষণমূলক (analytical) এবং সংশ্লেষণমূলক (synthetic) পদ্ধতি ব্যবহার করে ১৯৭১-২০১০ সময়কালের নির্বাচিত চলচ্চিত্র, আর্কাইভ ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ, সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা, লিঙ্গ সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতা কাঠামোর চলচ্চিত্রিক উপস্থাপন অন্বেষণ করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের ইতিহাস উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বাঙালির জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, সামাজিক বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক চেতনার ধারাবাহিক বিকাশকে প্রতিফলিত করে। 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬) থেকে শুরু করে পরবর্তী চলচ্চিত্রধারা ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বিশেষ করে জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটি রাজনৈতিক বাস্তবতার চলচ্চিত্রিক রূপায়ণ হিসেবে জাতীয় চেতনা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রসমূহ ইতিহাস পুনর্গঠন ও জাতীয় পরিচয় নির্মাণের সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। একই সঙ্গে সামাজিক বাস্তববাদ, লোকসংস্কৃতি, ইতিহাসভিত্তিক বর্ণনা এবং বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রধারার সহাবস্থান বাংলাদেশি চলচ্চিত্রকে বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছে। তবে বাণিজ্যিক চাপ, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং দর্শকনির্ভরতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা ও বাস্তবতার ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লিঙ্গ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে নারীর চিত্রায়ণ বহুলাংশে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত। পুরুষ চরিত্রকে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা চলচ্চিত্রে বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতারই প্রতিফলন। তবে একই সঙ্গে কিছু চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ এবং ধর্ম-আধুনিকতার সমন্বয়ে একটি সমন্বয়ী দার্শনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে, যা চলচ্চিত্রকে কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয় বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায়, বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত জীবন ও দর্শন বহুমাত্রিক ও জটিল; যা একই সঙ্গে সমাজকে প্রতিফলিত করে এবং সমাজকে প্রভাবিতও করে। তাই চলচ্চিত্রকে আরও অর্থবহ ও কার্যকর করতে হলে কারিগরি উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা, বাস্তবতার উপস্থাপন এবং শিল্পগত নান্দনিকতার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

References

আউয়াল, স. (২০১১)। চলচ্চিত্র কলার রূপ-রূপান্তর। দিব্য প্রকাশ।

আউয়াল, স. (২০১৭)। তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনা। প্রতিচিন্তা। https://www.protichinta.com/ প্রকাশ: ১৬ এপ্রিল ২০১৭, ১৭: ৩০

আবির, জে. ই. (২০১৬)। সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা: একটি পর্যালোচনা। নারী ও প্রগতি, ২৩। পৃ. ৩৭-৪৯।

আফসানা, জে. (২০১০)। চলচ্চিত্রের ত্রিবিধ রূপ: প্রকৃতি নির্ধারণ ও সম্পর্ক নির্ণয়। বাংলাদেশের হৃদয় হতে। ছায়ানট। তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

আহমেদ, আ. ই. (২০০৮)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: আর্থসামাজিক পটভূমি। বাংলা একাডেমী।

আহমেদ, ত. (২০১৮)। চলচ্চিত্রে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কাদের, মি. তা. (১৯৯৩)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প। বাংলা একাডেমী।

গায়েন, কা. (২০১২)। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়।

ঝুমা, জা. ফে. (২০১৪)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।

মোকাম্মেল, তা. (২০১৩)। চলচ্চিত্র ও সমাজভাবনা। মাওলা ব্রাদার্স।

রহমান, খা. ফে. (২০১৬)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বাণিজ্যিক স্বরূপ অনুসন্ধান। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।

রায়হান, জ. (১৯৭০)। চলচ্চিত্র: শিল্প ও সমাজ। প্রগতি প্রকাশনী।

হায়াৎ, অ. (১৯৮৭)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন।

হায়াৎ, অ. (২০১১)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়।

হায়াৎ, অ. (২০১৮)। চলচ্চিত্রবিদ্যা। পলল প্রকাশনী।

হোসেন, মা. (২০১০)। জাতীয় চলচ্চিত্র: পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা। In সিনেমা। মাহমুদুল হোসেন।

Hossain Raju, Z. (2015). *Bangladesh cinema and national identity: In search of the modern?* Routledge.

Kabir, A. (1979). *Film in Bangladesh.* Bangla Academy.